হারানো মণির আলো

সত্যবতী গিরি

একদা পুরনো কলকাতায় কত ধরনের ফেরিওয়ালাদের পথে দেখা যেত। নিঝুম দুপুরে ওঁরা চলে আসতেন গেরস্থ বাড়িতেও। দ্বিপ্রাহরিক সাময়িক আলস্যের অবসরে নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্ত গৃহিণীরা ওঁদের কাছেই সেরে নিতেন নিজেদের বাজার। তখন তো কলকাতায় শপিং মল, এসি মার্কেট তৈরি হয়নি—যেখানে কেনাকাটা, প্রেম করা, অনুষ্ঠান দেখা, খাওয়া দাওয়া, সিনেমা দেখা সব একসঙ্গেই সারা যাবে। অবিশ্যি এখনও এইসব জায়গা নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া গৃহিণীদের কাছে উত্তরমেরু আর দক্ষিণমেরুর দূরত্বে। এ কলকাতার মধ্যে মাথা তোলা এই আর একটা কলকাতার বর্ণাঢ্যতা আর মহার্ঘতা তাঁদের নাগালের বাইরে। তাঁরা এখনও ফেরিওয়ালাদের ডাকতে, তাঁদের জিনিস দেখতে, দরদাম করতে আর কিনতে ভালোবাসেন। এখনও এটা তাঁদের প্রয়োজন আর বিনোদন।

না, আমি কিন্তু কলকাতার ফেরিওয়ালা আর তাঁদের বিপণন কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত বাক্যাবলীর আলোচনায় যাচ্ছি না। এঁদের নিয়ে বড় বড় পণ্ডিতেরা গবেষণা করেছেন, বই লিখেছেন, নামী দামী প্রকাশনসংস্থা সেই বই ছেপে তৃপ্ত হয়েছেন।

কিন্তু আমার ছোটবেলায় মেদিনীপুরের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের কিছু মানুষ - যাঁরা আমার স্মৃতির ক্যামেরায় তোলা ছবি হয়ে গেছেন— তাঁদের কথা কেউ কোনদিন বলবেন না। অথচ আমার কৈশোরের অর্ধস্ফুট জগতে আমাদের জীবনযাপনের উল্লাসে এঁরাই মিশে আছেন। এঁদের কথা বাংলা সাহিত্যের কোনো ধারায় লেখা বইয়ের পাতাতে, ইতিহাসের পাতায় কোনোদিনই জায়গা পাবে না।

খুব ছোটবেলা থেকে মানে পাঁচ-ছ বছর বয়স থেকে দেখেছি একজন বয়স্কা বিধবা মহিলাকে ঝুড়ি নিয়ে আমাদের বাড়ি আসতে। আমাদের পাশের গ্রাম 'কন্দরপুর'- এ তার বাড়ি। পরনে আধময়লা সাদা ধুতি কাপড়, নাকি সুরে কথা বলত সে। তাই - তার নাম 'খনি', খোনা থেকেই খনি, তার ঝুড়িতে থাকত 'গুঁড়ি চুমুড়' (কুচো চিংড়ি)। ধবধবে সাদা মণ্ডার মতো দেখতে সেই চিংড়ি মাছ ঝুড়িতে নিয়ে সে ফিরত বাড়ি বাড়ি। যেমন চোখের সামনে ভেসে ওঠে রোগা ফর্সা সেই মানুষটির ঝুড়ির সামগ্রী, কুচো চিংড়ির সঙ্গে মেশানো থাকত সমুদ্রের গিরিয়া শাকের পাতা, ছোট্ট ছোট্ট সামুদ্রিক ঝিনুক আর গেঁড়ি। অনতিদূরবর্তী সমুদ্রের উপহার যেন সে বয়ে আনত আমাদের নিতান্ত অল্পে খুশি হওয়া কৈশোরে। মাছের সের দুপয়সা। কিন্তু বুড়ির কাছে কোনো দাঁড়িপাল্লা বা বাটখারা থাকত না। সে হাত দিয়ে আন্দাজ মতো তুলে দিত। আর তার বদলে পয়সা নয়, চাইত চাল। মা চাল না দিয়ে পয়সা দিতে চাইলে - নাকি সুরে সে বলত অনেক বাড়ির গিন্নীই তাকে চাল দেয়। মা-কে বেশি বিরক্তও করত না সে। কারণ সে ছিল মায়ের বিনে পয়সার রুগী, মায়ের কাছ থেকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ নিত।

আমি তখন ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ি। আমাদের রোজকার প্রয়োজনীয় ডাল তেল, নুন মসলাপাতি আর সেই সঙ্গে খাতা, পেন্সিল, কলম (কাঠের শরীর তার ওপরে নিব লাগানো, দোয়াতে থাকা কালিতে সেই নিব ডুবিয়ে লেখা হত), কালি (কালো বড়ি, দোয়াতের মধ্যে জল দিয়ে সেই বড়ি ফেলে দেওয়া হত। বড়ি পুরো গুলে গেলে তৈরি হত কালি)। হাতের লেখার খাতা ও আনতে হত বাড়ি থেকে প্রায় মাইল দেড়েক দূরে পিছাবনীর 'জগদীশ মান্নার দোকান' থেকে।

কিন্তু এর বাইরে তো সব বয়সের মেয়েদেরই জীবনের কিছু চাহিদা থাকে। সেগুলো মেটানোর মতো কোনো দোকান ধারে কাছে ছিল না-ছিল বাড়ি থেকে কুড়ি মাইল দূরে কাঁথি শহরে। কাঁথিতে যাওয়াও তখন অত সোজা ব্যাপার ছিল না— সারাদিন বাস চলত দুটো কি তিনটে। আর বাড়ির বউ ঝি কেন, বয়স্ক মহিলাদেরও তখন বাসে করে কাঁথি যাওয়া ছিল স্বপ্নের ভেতরেও স্বপ্ন।

কিন্তু তাই বলে সখ মেটানো কি কোনো উপায় ছিল না? আমাদের ওখানে ছিল বেলাত কাকা। বেলাত কাকা মহরমের সময় সুন্দর 'তাজিয়া' বানাত আরও অনেকের সঙ্গে। কী তার রং-এর বাহার। গেরস্থ বাড়িতে 'মঞ্জুর' -এর কাজ করার ফাঁকে ফাঁকে মাথায় মস্ত বড় ঝাঁকা নিয়ে ঘুরে বেড়াত বাড়ি বাড়ি। সেই ঝাঁকায় থাকত লাল, নীল, হলুদ, সবুজ-নানা রং। এর ফিতে, বেণী করার আগে চুলের গোড়া শক্ত করে বাঁধার জন্য সরু কালো ফিতে। লাল ঘুন্‌সি এক্কেবারে সরু ফিতের মতো। তার ভেতরে ফুটো কড়ি বা ছাঁদা পয়সা ঢুকিয়ে বাচ্চাদের কোমরে সেই ঘুন্‌সি বাঁধা হত। এটা তাদের সব বিপদ থেকে, অমঙ্গল থেকে উদ্ধার করবে। তাই এক্কেবারে কম্পালসারি। এখন দশকর্মার দোকানে ঘুন্‌সি পাওয়া যায়। কচিৎ কদাচিৎ লাগে কোনো অনুষ্ঠানে, যেমন অন্নপ্রাশনে। গ্রামের বাচ্চাদের কোমরেও এখন আর ঘুন্‌সি সেভাবে দেখা যায় না।

বেলাত কাকার ওই ঝাঁকাতে আরও থাকত সেলাই করার সূঁচ, সুতো, আসন তৈরির চট, বাচ্চাদের জন্য টিনের তৈরি ঝুমঝুমি, সিঁদুর, চিরুনি, ছোট আয়না, হরেক রং-এর প্ল্যাস্টিকের চুড়ি, শীতের দুপুরে বেশি আসত বেলাত কাকা। বাড়ির মেয়েদের তখন কাজকর্ম, খাওয়া দাওয়া শেষ, উঠোনে বেলাত কাকার ঝাঁকা মাঝখানে রেখে শীতের রোদ্দুরে গোল হয়ে বসে জিনিসপত্র কেনা আর দেখা হত। এখানেও পয়সার চেয়ে চালের চাহিদাই বেশি। আসলে এইসব

ভূমিহীন মানুষের দারিদ্র্য সেই সময় ছিল সীমাহীন। সন্তানসন্ততি আর বৃহৎ পরিবারের মুখে দুবেলা দুমুঠো ভাত যোগানো ছিল অসম্ভব ব্যাপার। আর মজুরির পয়সার পরিমাণ ছিল খুবই কম। সেই ষাট-এর দশকের গোড়ায় আর মাঝামাঝি সময়ে তাই এক আধ পয়সা নয়, 'কুঁটা' (চাল মাপার বেতের তৈরি ছোটপাত্র)-র মাপে চালই ছিল ওদের কেনাবেচার বিনিময়। ছোটোখাটো কালো কালো বেলাত কাকার মাথায় ছিল ঝাঁকড়া চুল, চোখগুলো গোলগোল। গ্রামে মাংস খাওয়া হত বেলাত কাকারই কৃপায়। কারও বাড়ির নধর পাঁঠা কয়েকজন মিলে কিনে নিত। বেলাত কাকাই জবাই করত। মেপে মেপে সবার বাড়িতে পৌঁছে দিত চাহিদা মতো। বেলাত কাকার এই ভূমিকাটা আমার তেমন পছন্দের ছিল না। বরং ভাবতাম যে মানুষ ঝাঁকায় করে আমাদের সামনে এনে দেয় মনোহারী নানা বস্তু, খুশিতে ভরে দেয় মন, যে মহরমের 'তাজিয়া' বানায় সে কেন এমন নিষ্ঠুর কাজ করে? এখন বুঝি এই দরিদ্র মুসলমান শ্রমজীবী মানুষেরা নিজেদের বিকল্প জীবিকা হিসেবেই এইসব কাজ করত। কারণ কৃষি ছাড়া আর কোনো জীবিকার উপায় ছিল না সেখানে। কিন্তু ঝাঁকা মাথায় করে হাসি মুখ বেলাতকাকাকে দূর থেকে দেখলেই খুশিতে ভরে যেত মন। বছরে ঐ অঞ্চলে দুবার মেলা হত বিছাবনীর কালীপুজোর মেলা, আর শীতকালে কালিন্দী হরিসমাজের মেলা। সেই মেলায় একটা টুকরোই যেন বেলাত কাকা আমাদের বাড়ির উঠোনে পৌঁছে দিত।

মামার বাড়ি আমাদের ওখান থেকে পাঁচ ছ মাইল দূরে ঘাঁটুয়া গ্রামে। বছরের বেশ কিছুটা সময় থাকতাম সেখানে। সেই গ্রামও বাঁধানো পিচ রাস্তা থেকে অনেক দূরে। ওখানেও এক গরীব মুসলমান বয়স্ক মানুষ আসত ঝাঁকায় এইসব জিনিস নিয়ে। তার বিশাল চেহারা, মাথায় সাদা চুল আর সাদা মোটা গোঁফ। একটা পা ফাইলেরিয়ার জন্য প্রচণ্ড ফোলা। সেই ফোলা পায়ের পাতা ঘিরে ছোট ছোট গোল আলু সাইজের মাংসপিণ্ড। মোটেই নয়নসুখকর নয়। তবু তাকে দেখলেই আমরা মামার বাড়ির বিশাল যৌথ পরিবারের বালক বালিকারা আর মহিলারা সবাই খুশি হতাম। তার আসল নাম জানি না। পা মোটা বলে তাকে বলা হত 'গধড়া গোড়িয়া' (ফোলা পা)। সেই নাম আর সেই মানুষটার ছবি এখনও খুব জীবন্ত হয়ে আসছে। তার বোধহয় আর একটা কারণও আছে। ছোটবেলায় মামার বাড়িতে বটতলায় ছাপা সচিত্র নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গলে গোদার যে ছবি দেখেছিলাম-ঐ মানুষটিকে প্রায় ঐরকমই দেখতে।

কয়েকটা - অন্তত দশবারোটা গ্রামের মাঝখানে হাট বসত সপ্তাহে দুদিন। দুটো হাট বসত—বসত নয়—এখনও বসে। পিছাবনী হাট আর কালিন্দী হাট। এখন হাটে আর কাঁথি শহরে থেকে কুড়ি পঁচিশ মিনিট লাগে বাসে আর কিছুটা সময় বেশি লাগে রিক্সায়। কিন্তু তখন ও সব কিছুই ছিল না। দুটো হাটই বাড়ি থেকে অনেক দূরে। তাছাড়া সব জিনিস তো হাট থেকে বয়ে আনা যেত না। সেইরকম কিছু জিনিস হল মাটির বাসন। আমাদের ছোটবেলায় বেশ কিছুদিন পর্যন্ত ভাত হত মাটির হাঁড়িতে। দুধ ফোটানো হত মাটির হাঁড়িতে, পিঠে পুলিও তৈরি হত মাটির পাত্রে। শীতকালে বা সারাবছর ধান সেদ্ধ করা হত বিশাল বড় মাটির গামলায়, তাকে বলা হয় ''ম্যাচলা''। বুড়ির চাল ভাজা হত গোলা গভীর বড় মাটির পাত্রে। সেটার নাম 'খুরপি'।

এইসব মাটির জিনিস বাঁকে করে, মাথায় বয়ে বাড়ি বাড়ি নিয়ে আসত কুমোর দাদা। ওর নাম আমার জানা নেই। চাল নয়, মাটির পাত্রের বদলে এঁরা অনেকসময় পয়সার জায়গায় চাইতেন ধান। ধান মেপে দেওয়া হত কাঠা বা বেতি-তে। ওগুলোও বেতের তৈরি-কুঁচার চেয়ে বড় পাত্র।

কুমোর দাদার কাছে থাকত মাটির প্রদীপ, পিলসুজ, চিতপিঠে করার চ্যাপ্টাপাত্র। তার নাম 'ত্যালাহ্নি'। পুলিপিঠে করার জন্য ফুটোওয়ালা হাঁড়ি, চাল ধোওয়ার জন্য ছোট ছিদ্রের মাটির হাঁড়ি, সরা, জিনিসপত্র রাখার জন্য ঢাকনাওয়ালা ছোট ছোট হাঁড়ি, তেল রাখার ছোট বাটি, তাকে বলা হত 'গিনা'। মা দরদাম করে এসব কিনত।

কুমোর দাদার বাড়ি নিশ্চয়ই অনেকদূরে ছিল। আমাদের গ্রামে কোনো কুমোরের চাক ছিল না। কামারশালা ছিল। আমাদের গ্রামে আর আশেপাশের কয়েকটা গ্রামে এক মাঝবয়সী মানুষ আসত টিনের বাক্সে নানাররকম মসলা মেশানো, চানাচুর মেশানো মটর সেদ্ধ আর আলুসেদ্ধ নিয়ে। সে তার নাম দিয়েছিল 'মধুগুলগুলি ভাজা' সেই মধুগুলগুলি বিক্রি করার জন্য সুন্দর একটা গান গেয়ে ঘুরত সে। গানের সবটা মনে নেই, একটা লাইনই স্মৃতিতে থেকে গেছে— ''ছুয়া কাঁদে, ছুয়ার মা পইসা বাঁধে' অর্থাৎ এই মধুগুলগুলি খাওয়ার জন্য বাচ্চারা বায়না ধরে, আর সেজন্য মায়েরা পয়সা জমায়।

এই গান দূর থেকে ভেসে আসামাত্রই আমরা বালক বালিকারা যে যে অবস্থায় থাকতাম বাবা মা-র কাছ থেকে পয়সা আদায় করে তার কাছে ছুটে যেতাম। অমৃতের স্বাদ তো কোনোদিন পাব না, মধুগুলগুলি আমাদের সেই অমৃত।

ক্বচিৎ কদাচিৎ আসত মস্ত কাঠের বাক্স কাঠের স্ট্যান্ডের ওপর বসিয়ে একজন মানুষ তার গোল ছোট ফুটোয় একচোখ বন্ধ করে এক চোখ রেখে তাকাতাম আমরা। দেখতে পেতাম নানা বিচিত্র ছবি। অবাক হতাম— মজা পাওয়ার চেয়ে বেশি।

সম্ভবত তখন ক্লাস ফোরে পড়ি। আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মাঠের মাঝখানে পর্দা টাঙিয়ে সিনেমা দেখানো হবে— বাড়ি বাড়ি ঘোষণা করে গেল একজন। পরম বিস্ময়ে আমার জীবনের প্রথম সিনেমা দেখলাম শীতের রাত্রে খোলা মাঠের মাঝখানে বসে। তার নাম ছিল 'দানের মর্যাদা'। ওতে একটা গান ছিল মনে আছে আমার— 'মুরলী বাজাও ঘনশ্যাম'।

তখন সমুদ্রের ধার থেকে— ঐ দাদনপাত্রবাড়, মাদারমণি (এখনকার মান্দারমণি), জলধা, চাঁদপুর থেকে মাছ

বাঁকে করে প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে সকালবেলা কাঁথিতে নিয়ে যেত জেলেরা। বাড়িতে আসা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তারা বাড়ি থেকে একটু দূরে মাটির রাস্তায় বাঁক নামাত। সমুদ্রের মাছ কেনা হত তাদের কাছ থেকে। একেবারে নামমাত্র মূল্যে। তেলতাঁপড়ি (এখানে কী বলে জানি না), রূপাপাটিয়া, চ্যাঁওয়া (গুলে মাছ), আঁইচ, চুমুড় (বিভিন্ন ধরনের চিংড়ি মাছ), শাঁক— কত নাম তাদের। এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত— গ্রামের লোক আর মাছ পানই না। সমুদ্রের ধার থেকেই লরিতে মাছ চাপিয়ে— তার ওপর বরফ দিয়ে চলে যায় দূর দূরান্তরে।

শুধু এরাই নয়-আরও যে কত ধরনের মানুষ আমাদের বড় হয়ে ওঠার আশেপাশে ভিড় জমায়। তারা কেউ আত্মীয় নয়, কুটুম্ব নয়। কিন্তু দৈনন্দিনতায় প্রবলভাবে লগ্ন, বেঁচে থাকার পরতে পরতে অপার বৈচিত্র্যের রং লাগিয়ে জীবনকে সমৃদ্ধ করে, মণিমুক্তোয় ভরিয়ে দেয় যেন।

আমার খুব ছোটবেলায় পটুয়ারা আসতেন বাড়িতে। বড় হয়ে কিন্তু তাঁদের আর দেখিনি। পরে বুঝেছি এঁরা আসতেন মহিষাদল থেকে, বর্তমানে পশ্চিম মেদিনীপুরের নানা জায়গা থেকে। লম্বা ছড়ানো পটে আঁকা থাকত পুরাণের বিভিন্ন গল্প, মনসামঙ্গলের, চণ্ডীমঙ্গলের গল্প। আমার বিশেষ করে মনে আছে মহাভারতের সাবিত্রী সত্যবানের গল্প। গান করে করে পট খুলে যেন প্রবহমান নদীর মতো গল্পের ধারা বইয়ে দিতেন এঁরা। বর্ণময় চিত্রল সেই স্রোতে ভেসে যেত আমার মুগ্ধ কৈশোর, আমার বিস্ময়ে মনে হত গল্প পড়া যায় জানি, শোনাও যায়। বাবা কত গল্প বলেন আমাদের । কিন্তু ছবিতে আর গানে মিশিয়ে এমন অপরূপ হয়ে ওঠে গল্প! গ্রামীণ শিল্পীর অসংস্কৃত উচ্চারণে দূর অতীত থেকে তুলে আনা সেই গল্প কথা মিশে যেত আমাদের জাগরণ আর স্বপ্নের সঙ্গে।

এই শিল্পীদেরও চাহিদা ছিল চাল আর পুরোনো সাদা পাতলা কাপড়ের। ওই কাপড়ের ওপর কাগজ লাগিয়ে ছবি আঁকতেন তাঁরা। এখন পটুয়াদের নিয়ে গবেষণা করেন লোকসংস্কৃতিবিদরা। কিন্তু এক প্রত্যন্ত গ্রামে সাধারণ মেয়ে আমি। আমার ছোটবেলায় এই দেশজ কবি - চিত্রীরা যে বিস্ময়মাখা শিল্পভোগের সুখ জাগিয়েছিলেন -তা কোনো গবেষকদের গবেষণাতেই ধরা যাবে না কোনোদিন।

কাকমারা সম্প্রদায় নিয়েও গবেষণা হয়েছে বেশ কিছু। জানা গেছে দাক্ষিণাত্য থেকে এসেছিল এরা। একসময় দাক্ষিণাত্যের কোনো অঞ্চলে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের জন্য কিছু মানুষ ছড়িয়ে পড়ে দূর দূরান্তরে।

কিন্তু ছোটবেলায় এসব কিছুই জানা ছিল না আমার। দেখতাম লম্বাচওড়া হাতে লোহার বালা পরা আর লোহার ছুরি হাতে নেওয়া এক আধজন মানুষ ভিক্ষে নিতে এসে। লোহার পালায় লোহার ছুরির আগাতে সুর তুলে তুলে এক দুর্বোধ্য ভাষায় গান করত এরা। ছোটবেলায় পুলিশকে যেমন ভয় পেতাম, তেমনি এদের দেখলেও ভয় পেতাম। কিন্তু সেই ভয় যে অমূলক তা এখন বুঝি।

ভিক্ষে চাইতে আসত যারা তাদের মধ্যেও ছিল নানা ধরনের মানুষ। মুসলিম কাকার বাড়ি ছিল আমাদের গ্রামেই। ধর্মে মুসলমান এই মানুষটির কথা ছিল মিষ্টি, কণ্ঠস্বরও মধুর, বৈষ্ণব পদ গেয়ে চাল নিত মায়ের কাছ থেকে। পরে দেখেছি আমার শ্বশুর বাড়ির গ্রামেও তার যাতায়াত আর জনপ্রিয়তা।

আর একজনের কথা আমার বিশেষভাবে মনে আছে। অনেকবার দেখেছি তাকে - অনেকবার এসেছে আমার বাড়িতে। কদমছাঁট পাকা চুল, মোটাসোটা, ময়লা থান পরা - এক বৃদ্ধা। তাকে আমাদের ওখানে সবাই বলত তেঁতুলতলার বুড়ি - অর্থাৎ তার বাড়ি তেঁতুলতলা গ্রামে। গ্রাম পরিচয়ে সমৃদ্ধা এই বর্ষীয়সী এসেই আমাদের মাটির বাড়ির বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসত। চাল নেওয়ার পর অবধারিতভাবেই ভাত খেত। মা কোনসময় ভাতের বদলে মুড়ি দিতে চাইলে বলত-" মোকে টিকে তনি দ্যানে-বি হব, মু ভুজা খাইবানি।" (আমার একটু পান্তার জল দিলেও হবে, আমি মুড়ি খাব না)। একবারের কথা আমার বিশেষভাবেই মনে আছে। হয়তো - বা সেই ঘটনার জন্যই তেঁতকুলতলার বুড়ির কথা আমি ভুলব না কোনোদিন।

ছুটির দিনে সবার শেষে মা খেতে বসেছে। খাওয়া তখনও শুরু করেনি সবে ভাত বেড়েছে। তেতুলতলার বুড়ি হাজির। তখন কার্তিক মাস। পাকা ধান ওঠার আগে এই সময়টায় আমাদের গ্রামের অনেক মানুষ দু তিন দিন ভাত খেতে পেত না। গিরিয়া শাক সেদ্ধ, সজনে শাক সেদ্ধ খেয়ে পেট ভরাত। বুড়িও সেই কথা বলল। সে তিন দিন ভাত খায়নি। ভিক্ষে করে যা নিয়ে গেছে বাড়ির ছেলেপুলেদের পেটও তাতে ভরেনি। হাঁড়িতে আর ভাত ছিল না। দুপুর গড়িয়েছে তখন, আমার মা অন্নপূর্ণা নিজের বাড়া অন্ন সাজিয়ে দিল বুড়ির সামনে। ভাত খেতে বসে চোখের জলে ভাসল সে, মাকে হাত তুলে আশীর্বাদ করতে গিয়ে কথা বলতে পারল না।

এই ছবি আমার মনের ক্যানভাসে আঁকা হয়ে আছে চিরকালের মতো। এখনও চোখ বন্ধ করলে পরপর দেখতে পাই তার হাসিমুখের ছবি আর কান্নাভেজা করুণ চোখ।

আমার ছোটবেলা, আমার কৈশোরে অনেক অপ্রাপ্তি আছে হয়তো— কিন্তু এই পরম পাওয়াগুলো সেইসব অপ্রাপ্তিকে ভুলিয়ে দিয়েছে।